একদিন রুচি তার বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তার বারো বছরের জীবনের প্রথম বিদ্রোহ। উপলক্ষটা অতি সামান্য।

এমনিতেই সবাই জানে। রুচি বাচ্চা বয়েস থেকেই শান্ত ধরনের মেয়ে, একটুও জেদি নয়, গুরুজনদের কথার অবাধ্য নয়, সে আপন মনে থাকে। সে মন দিয়ে পড়াশুনো করে, ছবি আঁকে। অন্য বাচ্চা মেয়েদের তুলনায় তার একটাই বৈশিষ্ট্য, সে প্রায়ই আপন মনে কথা বলে। বেশ জোরে জোরে। পাশের ঘর থেকে শুনলে মনে হয়, সত্যিই যেন তার সামনে কেউ রয়েছে। অন্য কেউ এসে পড়লেই সে লজ্জা পেয়ে থেমে যায়।

ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে বাবা-মায়েদের, বিশেষত মায়েদের নানারকম আশঙ্কা থাকে। প্রথম প্রথম শ্রীলা ভাবতেন, এটা বুঝি তাঁর মেয়ের কোনও অসুখ। হাতেই কাছেই ডাক্তার রয়েছে, শ্রীলার নিজের মেজদাই পিজি হাসপাতালের হার্ট সার্জন। তিনি শ্রীলার ভয়ের কথাটা শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। না, না। রুচি একেবারে নর্মাল চাইল্ড। চিন্তার কিছু নেই। বয়েস হলে ওসব কেটে যাবে।

তাতেও অবশ্য শ্রীলার চিন্তা ঘুচে যায়নি। বাড়ির লোক ডাক্তার হলে তার ওপর যেন বেশি ভরসা করা যায় না। শ্রীলার মেজদা সত্যেশ সেনগুপ্ত হার্ট স্পেশালিস্ট, বাইপাশ অপারেশন করেন, কিন্তু হার্ট আর মন যে এক নয়, তা এখন সবাই জানে। কাব্য করে যতই হৃদয়ের কথা বলা হোক, আসলে কিন্তু হৃদয় বা হৃৎপিণ্ডে মন থাকে না, মনের স্থান মস্তিষ্কে। এটা যদি রুচির মনের অসুখ হয়, তা হলে শল্য চিকিৎসক সত্যেশ সেটা বুঝবেন কী করে।

পরিবারে একজন ডাক্তার থাকলে অন্য কিছু ডাক্তারদের সঙ্গেও চেনা হয়ে যায়। সত্যেশের ছাত্র-জীবনের, মেডিক্যাল কলেজের তিন-চারজন বন্ধুকে শ্রীলা বিয়ের আগে থেকেই চেনে। তাদের মধ্যে একজন দীপ দাশগুপ্ত, বন্ধুর ছটফটে, বিদ্যুৎ ঝলকের মতন কিশোরী বোনটির দিকে প্রায়ই তরল চোখে তাকাত। দীপ দাশগুপ্ত সুদর্শন পুরুষ। চক্ষু দুটি খুবই গভীর, সে চোখ দিয়ে তরল দৃষ্টি নিক্ষেপ করা সোজা কথা নয়। শ্রীলাও যে কোনও গপের বই পড়তে পড়তে নায়কের চেহারাটা ঠিক দীপ দাশগুপ্তর মতন কল্পনা করে নিত। মাঝে মাঝে কাঁধে হাত রাখা আর একদিন, হঠাৎ যেন লেগে গেল, এইভাবে ছোঁওয়া ছাড়া দীপ দাশগুপ্ত শ্রীলার সঙ্গে আর বেশি দূর এগোননি, চলে গেলেন বিলেত। ফিরে এলেন মেমবউ নিয়ে। এখন তিনি বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে অন্তত এক মাস লাগে। তাঁর সেই মেম-বউ আর নেই, এখনকার স্ত্রী পাঞ্জাবিনী। শ্রীলার সঙ্গে হঠাৎ কখনও কোনও নেমন্তন্ন বাড়িতে দেখা হলে এখনও তিনি তরল চোখে তাকান, তবে ওই পর্যন্তই, কাঁধে হাত রাখা চলে না।

শ্রীলা একদিন সস্ত্রীক দীপ দাশগুপ্তকে নেমন্তন্ন করল নিজের ফ্ল্যাটে। সঙ্গে আরও কয়েকজনকে অবশ্য। কিন্তু মেজদা সত্যেশ তখন নেপালে, মেজদাকে বাদ দিতেই চেয়েছিল শ্রীলা।

দীপ দাশগুপ্তকে শ্রীলা মেয়ের সম্পর্কে উদ্বেগের কথা জানাল। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলল, রুচিকে সে কিছুতেই দীপ দাশগুপ্তের চেম্বারে নিয়ে যেতে পারবে না। মনের যে কোনও রোগের চিকিৎসক হলেই এদেশে তাঁদের বলে পাগলের ডাক্তার। যদি জানাজানি হয়ে যায় যে রুচিকে দীপ দাশগুপ্ত দেখছেন, তা হলেই সবাই ধরে নেবে, মেয়েটা পাগল।

দু-পেগ হুইস্কি পান করার পর দীপ দাশগুপ্ত রুচির ঘরে গিয়ে বলল, তোর সঙ্গে আমি একটু গল্প করব। তোর আপত্তি নেই তো ?

মামার বন্ধু এসে কথা বলতে চাইলে রুচি আপত্তি করবে কেন ? সে তো আর জানে না যে দীপ দাশগুপ্তর কথা বলা মানে চিকিৎসার প্রক্রিয়া। জানলেই বা সে কী করত। বাড়িতে বেশি লোকজন এলে সে তার নিজের ঘরে লুকিয়ে থেকে পড়াশুনার ভান করে, অন্যদের সঙ্গে কথা বলতেই লজ্জা করে তার। নিজের সঙ্গে কথা বলার সময়ই সে সবচেয়ে সহজ ও স্বচ্ছন্দ।

রুচির একটা নিজস্ব ঘর আছে। দেওয়ালে অনেক ছবি ও পোস্টার সাঁটা। তার বয়েসি ছেলেমেয়েরা অনেক খেলোয়াড় বা গায়কের ছবি পুজো করে, রুচির ঘরের ছবিগুলো অবশ্য তাদের নয়, সবই প্রকৃতির। পাহাড়, সমুদ্র, নদী, অরণ্য, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ক্যালেন্ডার থেকে কেটে রাখা। নিজের আঁকা ছবি সে সহজে কাউকে দেখাতে চায় না। তার ঘরে গল্পের বইও কম নেই।

দীপ দাশগুপ্ত রুচির চেয়ারটায় বসে, একটু চুরুট ধরিয়ে প্রথমে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরটার ছবি ও বই দেখতে লাগলেন।

তাঁর প্রথমেই মনে হল, তিনি রোগী দেখেন নিজের চেম্বারে। আসলে, মনোরোগের চিকিৎসা করতে গেলে, প্রত্যেকে রোগীর বাড়িতে গিয়ে তার নিজস্ব পরিবেশটা দেখা দরকার। কিন্তু তার সময় কোথায় ?

তারপর তিনি ভাবলেন, রুচির এখন যা বয়েস, তার মা শ্রীলাকেও তিনি প্রথম দেখেছিলেন ঠিক এই বয়েসে। বারো-তেরোই হবে, সদ্য পিউবার্টি এসেছে। শ্রীলার সঙ্গে তার মেয়ে রুচির মুখের ও শরীরের গড়নেও বেশ মিল আছে। অর্থাৎ দীপ

দাশগুপ্ত একটু ক্ষণের জন্য ফিরে গেলেন নিজের প্রথম যৌবনে। কিশোরী শ্রীলাকে যখন প্রথম দেখেন, তখন তাঁর নিজের বয়েস উনিশ-কুড়ি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, সত্যেশদের চেতলার বাড়িতে, এক মেঘলা সন্ধ্যায়, কেন যেন কাছাকাছি কেউ আর ছিল না। তিনি শ্রীলার কাঁধে হাত রেখে তাকে টেনেছিলেন বুকের দিকে।

ডাক্তারি পাশ করার পর তিনি ইচ্ছে করলেই অনায়াসে বিয়ে করতে পারতেন শ্রীলাকে। তা হয়নি, দুজনের জীবন গেছে অন্যদিকে। যদি তিনি শ্রীলাকে বিয়ে করে ফেলতেন, তা হলে কি এই রুচি নামের মেয়েটি তাঁর আত্মজা হত ? জিন ফ্যাক্টর ও ক্রোমোজোম বিষয়ে শেষতম জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এরকম একটা অবাস্তব, অলীক চিন্তা একজন চিকিৎসকেরও মাথায় আসতে পারে !

একটু ক্ষণের জন্য দীপ দাশগুপ্ত নিজেরই মন বিশ্লেষণ করলেন। না, এই মেয়েটিকে দেখে তার নিজের মেয়ের মতন মনে হচ্ছে না, কিংবা বাৎসল্য রসও জাগছে না। (দুটি বিবাহেই তিনি কোনও সন্তানের জনক হননি।) রুচি তাঁর অচেনা। সে একটি কিশোরী, বয়েসের তুলনায় বাড়বাড়ন্ত, যে এর মধ্যেই কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের দ্বারে এসে করাঘাত করছে।

তিনি রুচিকে বললেন, তোমার বয়েসি একটা মেয়ে আমার মতন বুড়োদের সম্পর্কে কী ভাবে, তা নিয়ে আমি দশটা প্রশ্ন করতে চাই। মাঝখানে কেউ এসে যাতে ডিসটার্ব না করে, তাই তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও !

দীপ দাশগুপ্ত কী কী প্রশ্ন করেছিলেন, তা শুধু ওরা দুজনেই জানে। ঘন্টাখানেক পরে বেরিয়ে এসে, আরও একটা হুইস্কি খেয়ে, তিনি শ্রীলাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, তোমার মেয়ে সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। পারফেক্টলি নর্মাল অ্যান্ড হেলদি চাইল্ড। অন্যদের তুলনায় রুচি একটু বেশি কল্পনাপ্রবণ। বেশি লোকের সঙ্গে মেশে না, কিন্তু নিজের মনে মনে কিছু চরিত্র করে নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে। তাতে তো ভয়ের কিছু নেই। হয়তো রুচি ভবিষ্যতে আর্টিস্ট হবে। আর্টিস্টরা এরকম হয়। তবে, শুধু একটা ব্যাপারে তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ওর অন্তত আঠারো-উনিশ বছর বয়েস পর্যন্ত ওকে একলা একলা কোথাও যেতে দিও না। এই ধরনের অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ ছেলেমেয়েরা, একা একা বাড়ির বাইরে গেলে হারিয়ে

যেতে পারে। এরকম অনেক কেস হিস্ট্রি আছে। আর আমাদের দেশে, মেয়েদের ব্যাপারে যে বেশি সাবধান হতে হয়, তা বলাই বাহুল্য।

দীপ দাশগুপ্তর এই শেষোক্ত সতর্কবাণীর জন্য রুচির জীবন বিষময় হয়ে গেল।

রুচির বাবা আর মায়ের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক তফাত। শ্রীলা যেন নিজের বাল্য ও কৈশোরের কথা একেবারেই ভুলে গেছে। সে যে ওই বয়সে কত দুরন্ত ও ছটফটে ছিল, নিজের অভিভাবকদের লুকিয়ে কিছু কিছু অসমীচীন কাজটাজও করেছে। তা আর মনেই পড়ে না। এই বারো বছর বয়েসেই রুচির বুকে ঢেউ দেখা গিয়েছে। সে রজঃস্বলা হয়েছে, সুতরাং যৌন চেতনা এসে গেলেই সেসব মেয়েদের প্রলোভন দেখাবার জন্য অনেক বাঘ-সিংহ ঘুরে বেড়ায়। অর্থাৎ এখন মেয়েকে সর্বক্ষণ রাখতে হবে চোখে চোখে।

লেখাপড়া শিখে, কোনও বড় অফিসারের বউ হওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার আগে মেয়েকে বাইরের পৃথিবীর আলো-বাতাসের স্পর্শ পাওয়ার অধিকার দেওয়া যায় না। মেয়ের ভবিষ্যৎ এখন মায়ের হাতে।

রুচির বাবা রজত একটু ন্যালা ধরনের মানুষ। রজত একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির মোটামুটি উঁচু পদের অফিসার হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বটে, নিজের সংসারে তার ব্যক্তিত্ব কমজোরি। সে তার স্ত্রীকে ভয় পায়, স্ত্রীর অনুশাসন নতমস্তকে মেনে চলে। ব্যাপারটা হয়তো এত সরল নয়। স্ত্রীকে ভয় পাচ্ছে কেন রজত ? শ্রীলাও চাকরি করে বটে, কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি ও উপার্জন রজতেরই অনেক বেশি। আসলে সে অতি ভদ্রলোক এবং অপছন্দ করে নাটকীয়তা। শ্রীলার মতামতের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে যদি ঝগড়াঝাঁটি বেধে যায়, তা হলে হঠাৎ চুপ করে যায় রজত। সব ঝগড়াঝাঁটির মধ্যেই খানিকটা নাটুকেপনা থাকে, তাতে কোনও ভূমিকা নেওয়া বদলে হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে গিয়ে মৃদু হাসি দেওয়াটাই সে বেশি উপভোগ করে।

রজতের ব্যক্তিগত ধারণা, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠবে গাছপালার মতন, স্বাধীন ও স্বাভাবিকভাবে। গোড়ার দিকে একটু নজর রাখতে হয় যে বাইরের প্রভাবে বিপথে যাচ্ছে কিনা। যদি দেখা যায়, তাদের একটা নিজস্ব মতামত গড়ে উঠেছে, তা হলে

আর তাদের ওপর খামোকা বেশি বেশি বিধিনিষেধ প্রয়োগের কোনও মানেই হয় না। রজত নিজেও এভাবেই বর্ধিত হয়েছে এক বড় একান্নবর্তী পরিবারে। যে মেয়ে স্কুলের পড়াশুনা ঠিকঠাক করে, আবার ছবিও আঁকে, তার সম্পর্কে অকারণ দুশ্চিন্তার কোনও কারণই নেই। সেই জন্যই রজত তার মেয়ের কোনও ইচ্ছেতেই বাধা দেয় না। কিন্তু শ্রীলা যখন রুচি সম্পর্কে নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করতে যায়, তখন রজত তা পছন্দ বা সমর্থন না করলেও প্রতিবাদ করে না। যেন রুচি শ্রীলার একলারই মেয়ে, সে যা ভাল বোঝে করুক।

অনেককেই মনে হবে, রজতটা একটা ব্যক্তিত্বহীন মাগ ভেড়ুয়া। একমাত্র শ্রীলাই সেটা বিশ্বাস করে না। সে জানে, রজত বাইরে যতই দুর্বলতা দেখাক, আসলে ভেতরে ভেতরে সে কঠিন পুরুষ, হঠাৎ যে কখন বিস্ফোরণ ঘটাবে, তার ঠিক নেই। শ্রীলা প্রায়ই রজতের দিকে সংশয়ের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

নেমন্তন্ন আর নেমন্তন্ন। স্বচ্ছল উচ্চবিত্ত, এমনকি মধ্যবিত্ত পরিবারেও এটা একটা আধুনিক ব্যাধি। এখন অবশ্য নেমন্তন্ন বদলে বলা হয় পার্টি। আজ এর বাড়ি, কাল ওর বাড়ি। সকলেই মনে মনে একটা হিসেব থাকে। এক মাসে তুমি যদি ছটা পার্টিতে আমন্ত্রিত হও, তাহলে তোমার বাড়িতেই ডাকতে হবে সপ্তম পার্টি। তুমি যদি এই বৃত্তের মধ্যে না থাক, তাহলেই তুমি সামাজিকভাবে নিচু হবে যাবে, ছিটকে যাবে সেই বৃত্ত থেকে।

কেউ কেউ অবশ্য এই হিসেবের ঊর্দ্ধে উঠে যায়। নিজের বাড়িতে পার্টি দেয় ঘন ঘন। সে যে প্রতিদানের অপেক্ষা না রেখেই অন্যদের ডাকে, তাতেই প্রমাণ করতে চায়, তার আর্থিক জোর অন্যদের চেয়ে বেশি।

রণ চৌধুরী সে রকমই স্বভাব। একটা ব্যাটারি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। মাইনে ছাড়াও অতিথি আপ্যায়নের জন্য বিশেষ তহবিল আছে হয়তো। তবে, এ কথাও ঠিক, মানুষটি দিলদরিয়া, মজলিশী এবং হইচই, আড়ম্বর পছন্দ করেন। রণের স্ত্রী বিদূষী এবং সুগায়িকা, প্রচুর পানীয় ও খাবারদাবারের সঙ্গে তার স্ত্রী জিনিয়া যখন সঙ্গীত পরিবেশন করে, তখন আবেশে ও তৃপ্তিতে রণের চোখ বুঁজে আসে।

এসব পার্টির নিয়ম এই যে পরিচিতদের মধ্য থেকে বেছে বেছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কয়েকজনকে ডাকা হয় এক একবার। রণ চৌধুরী বাড়ির পার্টিতে শ্রীলা ও রজতের কিন্তু আমন্ত্রণ থাকে প্রত্যেকবার, ওরা নিয়মের মধ্যে পড়ে না, কারণ জিনিয়া আর শ্রীলা একসঙ্গে কলেজে পড়েছে। জিনিয়া নিউ মার্কেটে বাজার করতে এলে তার ছেলেমেয়ে দুটিকে রেখে যায় শ্রীলার বাড়িতে। ছেলেমেয়ে দুটি যমজ, ঠিক রুচির বয়েসি।

শ্যামনগরে বিশাল কম্পাউন্ডের মধ্যে রণ চৌধুরী বাংলো। তা যেমনই সুদৃশ্য, তেমনই বাইরের জগৎ থেকে একেবারে আলাদা এবং প্রচুর কাজের লোক। রণ চৌধুরীর পার্টি বন্ধু-বান্ধবরা সবাই পছন্দ করে, খাদ্য-পানীয়, আড্ডা, গান-বাজনা সবদিক থেকেই ভাল, শুধু একটাই অসুবিধা, গাড়ি চালিয়ে যেতে হয় অনেকখানি, ফিরতে ফিরতে রাত দুটো-আড়াইটে তো হয়ই।

ইদানীং সব ছোট ছোট পরিবার। স্বামী-স্ত্রী ও একটি-দুটি সন্তান। স্বামী ও স্ত্রী এই ধরনের পার্টিতে গেলে ছেলেমেয়েরা থাকবে কোথায় ? রণ চৌধুরীর পার্টিতে অবশ্য এ নিয়ে কোনও অসুবিধা নেই, কোয়ার্টারে অনেকগুলি কক্ষ, বন্ধু-বান্ধবদের ছেলেমেয়েরাও আসে, অন্য ঘরে জটলা করে, টিভি দেখে, খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। শ্রীলা ও রজত প্রত্যেকবারই রুচিকে নিয়ে এসেছে, রাত্রি পেরিয়ে যাওয়ার পর বাড়ি ফেরার সময় ঘুমন্ত রুচিকে পুতুলের মতন টেনে টেনে শুইয়ে দিয়েছে গাড়িতে।

এবারেই রুচি বলল, সে যাবে না।

কেন যাবে না ?

রুচি কোনও কারণ জানাবে না। শুধু বলল, ইচ্ছে করছে না। মানুষের ইচ্ছে অনেক সময় যুক্তির ধার ধারে না। বামনের যেমন চাঁদ ধরার ইচ্ছে হয়। রাজার ছেলে ইচ্ছে করে সিংহাসন ত্যাগ করে। কারওর দুধ খেতে ইচ্ছে করে না, কেউ মদের নেশার মতন দুধ বেশি খায়। কারওর মেঘের ডাক শুনলে বিছানায় যেতে ইচ্ছে করে না, কেউ ইচ্ছে করে সব আলো নিভিয়ে বসে থাকে অন্ধকারে।

শ্রীলা বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, কেন যাবি না ? গত মাসেও তো গেছিস, টুম্পা আর বাবলুর সঙ্গে ক্যারাম খেলতে পারিস কিংবা খেলতে যদি না চাস, কত বই আছে ও বাড়িতে --

রুচি তবু যেতে রাজি নয়। সে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

মেয়ের এমন জেদ দেখে শ্রীলা হকচকিয়ে গেল। আগে তো কখনও দেখেনি। অধিকাংশ মানুষই কার্য-কারণ সম্পর্ক জানতে চায়, ব্যবহারের দুর্বোধ্যতা পছন্দ করে না। রুচি হঠাৎ বদলে গেল কেন ?

রজত বলল, থাকে না। অত জোর করার কী দরকার ?

শ্রীলা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, জোর করব না মানে ? ও একলা থাকবে বাড়িতে ?

থাকুক না।

একলা থাকবে ? কোনওদিন থেকেছে ? তুমি কিছু বোঝ না। ও যদি যেতে না চায় ! কেন যেতে চাইছে না, সেটাই তো জানতে চাইছি। আগের দিন কিছু হয়েছে ও বাড়িতে ? কেউ খারাপ ব্যবহার করেছে ? কী রে রুচি, কিছু হয়েছিল আগের দিন ?

রুচি দুদিকে মাথা নাড়ল।

তবে যাবি না কেন ?

রুচি আবার চুপ।

রজত বলল, আমার মনে হয় ও যখন যেতে চাইছেই না, তখন থাক না বাড়িতে। ও এখন বড় হচ্ছে।

বড় মানে কত বড় ? বারো বছর, নভেম্বরে তেরোতে পড়বে, এখনও পাঁচ মাস দেরি।

এই বয়েসে আমরা...

আবার বাজে কথা বলছ। ছেলেদের কথা আলাদা। এই বয়েসের মেয়েকে কেউ বাড়িতে একা রেখে যায় ? চারদিকে কত কী কান্ড ঘটছে।

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে থাকবে, তাতে আর ভয়ের কী আছে। রুচি, তুই কারোকে দরজা খুলবি না। চেনাশোনা হলেও না।

হঠাৎ শ্রীলার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল। ঢেউ খেলে গেল কপালে।

তার মনে পড়ে গেল দীপ দাশগুপ্তের কথা।

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রাখলে কেউ আসতে পারবে না। কিন্তু রুচি নিজেই যদি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যায় ? আগে কখনও একলা কোথাও যায়নি। আগে কখনও এরকম জেদও তো দেখায়নি। দীপদা বলেছেন, আঠারো-উনিশ বছর পর্যন্ত মেয়েকে চোখে চোখে রাখতে। একা বেরোলে হারিয়ে যেতে পারে।

আরও কিছুক্ষণ মেয়েকে বোঝাবার চেষ্টা করলে শ্রীলা। কিন্তু রুচি অনড়। শ্রীলার মেজাজ চড়ে গেল, ইচ্ছে করল মেয়ের মাথার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে। কিন্তু কোনওদিন সে মেয়ের গায়ে হাত তোলেনি। সেরকম দরকারই হয়নি।

পুরো সাজগোছ হয়ে গেছে, তবু শ্রীলা বলল, ঠিক আছে, তা হলে আমরাও যাব না। দরকার নেই।

এটা কথার কথা। এই ধরনের পার্টি শ্রীলার খুব পছন্দ। খুব মজা হয় তো বটেই, একটু জিন খেয়ে শ্রীলা নাচতে শুরু করে, সবাই হাততালি দেয়।

রজত বলল, যাব না ? তন্ময় আর যমুনাকে তো আমাদের গাড়িতেই তুলে নিয়ে যাবার কথা। ওরা অপেক্ষা করে বসে আছে।

তা হলে তো যেতেই হবে। শ্রীলা একটা ছুতো পেয়ে বিবেকের দায় মুক্ত হল। তন্ময়দের তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা দেওয়া আছে। রজতকে একা ছেড়ে দেওয়াও যায় না। বউয়ের নজরছাড়া হলেই বেশি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে। আর ওই যমুনা, সে রজতের পাশ ছেড়ে নড়ে না। রজতও যমুনা সম্পর্কে বেশ দুর্বল।

এবার শ্রীলা দুম করে বলে বসল, তা হলে আমি বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাব।

রজত আঁতকে উঠে বলল, সেকি, এত বড় মেয়েকে ... তালা বন্ধ করে যেতে হবে কেন ?

শ্রীলা বলল, এত বড় হয়েছে বলেই তো ... বড় হয়েছে। বুদ্ধি তো বাড়েনি, কখন কাকে দরজা খুলে দেবে ... একা একা রেখে গেলে আমার কিছুতেই শান্তি হবে না।

রজত বলল, যা, তালা দিয়ে গেলে বিশ্রী দেখাবে।

দেখাক বিশ্রী।

রুচি জেদ ধরতে পারে, শ্রীলারও জেদ কম নাকি ?

রজত জানে, সে স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করলেও লাভ হবে না। সে তাকিয়ে রইল মেয়ের দিকে।

রুচি চুপ করে আছে।

তা হলে কি তালা বন্ধ অবস্থায় থাকতেও ওর আপত্তি নেই ?

শ্রীলা সত্যি সত্যি বাইরে বেরিয়ে একটা তালা লাগিয়ে দিল। মেয়ের সঙ্গে আর কথা বলল না একটাও।

ফ্ল্যাটে একজন কেউ আছে, তবু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ রাখা আর বাইরে তালা দেওয়ার অবস্থাটা এক হতে পারে না।

রুচি আপত্তি করেনি। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে, আর কোনওদিন সে মা-বাবার সঙ্গে কোনও পার্টিতে যাবে না। সে বন্দিনী হয়ে থাকতেও রাজি।

বন্দিনী অবস্থায় এমন অনেক কিছু করা যেতে পারে, যা রুচি আগে কখনও করেনি। সে নাচতেও পারে, চেঁচিয়ে গাইতে পারে, মাটিতে গড়াগড়ি দিতে পারে, রান্না গ্যাস জ্বালিয়ে এক সঙ্গে চারটে ডিম সেদ্ধ করে খেতে পারে।

আজকের নেমন্তন্নটা কয়েকদিন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, তাই এ বেলার জন্য রান্না হয়নি। রান্নার দিদিকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

রুচিকে অবশ্য না খেয়ে থাকতে হবে না।

ফ্রিজে ভাত আছে, গতকালের খানিকটা মাংসও আছে, সে সব মাইক্রোওয়েভে গরম করে নিতে বলা হয়েছে রুচিকে। রুচি এখনও রান্না শেখেনি, কিন্তু গরম করে নিতে পারে।

এখন রাত পৌনে আটটা। মা-বাবার ফিরতে ফিরতে সাড়ে বারোটা কিংবা পৌনে একটা তো হবেই।

এর মধ্যে কেউ যদি এসে দরজায় বেল দেয় ?

তপন কাকা তো আসতেই পারে। এ পাড়ারই একটা স্টুডিওতে সাউন্ড রেকর্ডিস্টের কাজ করে তপনকাকা। রাত নটায় ছুটির পর প্রায়ই এখানে আসে, বাবার সঙ্গে হুইস্কি খায়। তপনকাকা কি জানে যে আজ বাড়িতে কেউ থাকবে না ?

ধরা যাক জানে না।

কয়েকবার বেল দেওয়ার পর বাইরের তালাটা নজরে পড়বে, কেউ নেই বুঝতে পেরে ফিরে যাবে।

তালা দেওয়া ফ্ল্যাট নিশব্দ থাকে। কিন্তু রুচি যদি তখন ভেতর থেকে জিনিসপত্র টানাটানির শব্দ করে ? তখন মুখের অবস্থাটা কী রকম হবে তপন কাকার ? ভাববে, ভেতরে চোর ঢুকে বসে আছে।

কিংবা রুচি যদি তখন হি হি করে হেসে ওঠে ? একবার হেসেই চুপ করে যাবে। বাইরে থেকে ডাকলেও সাড়া দেবে না।

তখন কি তপনকাকা ভূতের ভয়ে দৌড়ে পালাবে, না পুলিশে খবর দেবে ?

তপনকাকার সেই অবস্থাটা ভেবেই হাসি পেয়ে গেল রুচির ?

তপনকাকাদের স্টুডিওটা দুবার দেখতে গিয়েছিল রুচি। কিছু কিছু টিভি সিরিয়ালের শুটিং হয় ওখানে। বিশেষত নাচ-গানের দৃশ্য। কী রকম যেন রূপকথার জগতের মতন।

গত সপ্তাহে রুচি যেদিন দেখতে গিয়েছিল, সেদিন ছিল একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকের শুটিং, নবাবের দরবারে নাচছে রূপা গাঙ্গুলি। একটানা হয় না, হঠাৎ থেমে যায়, কে যেন বলে ওঠে এবার করতে হবে। ক্যামেরা সরাতে হয়। রূপা গাঙ্গুলির নাচ থামিয়ে এসে একটা বেতের মোড়ায় বসে কোকাকোলার বোতলে চুমুক দেয়। তপনকাকার কানে হেড ফোন।

আজও কি সেই রকমই দৃশ্য হচ্ছে ?

তপনকাকা কাজ শেষ হলে আজ আসবে, কি আসবে না ?

রুচি বেশ জোরে জোরে বলে উঠল, তপনকাকা, প্লিজ চলে এসো। বেশ মজা হবে।

তপনকাকা কান থেকে হেড ফোন সরিয়ে জিজ্ঞেস করল, কে, কে ডাকছে আমাকে ?

তপনকাকা, তুমি আজ ইন্দ্রধনু অ্যাপার্টমেন্টে আসবে না ?

রুচি ? আজ আমার ছুটি হতে দেরি হবে।

কত দেরি ? সাড়ে নটা, দশটা হলেও এসো।

দশটা ? তা হতে পারে। কী রান্না হয়েছে আজ তোদের বাড়িতে ?

মাংস আছে। আমি ডিম সেদ্ধ করে দিতে পারি।

আসছি।

লিফটের দরজাটা এই সাততলায় এসে খুলল। শব্দটা ঠিক টের পাওয়া যায়। তপনকাকা এবার বেল দেবে। তালাটা দেখতে পাবে না।

সাড়া দেবে না রুচি। তপনকাকা হকচকিয়ে যাবে। তারপর তালাটা দেখতে পেয়ে --

সত্যি সত্যিই দরজায় কেউ বেল দিল।

সারাদিন নানারকম ফেরিওয়ালা আসে। রাত্তিরে তো কেউ আসবে না। অন্য কোনও আত্মীয়-স্বজন হতে পারে।

পা টিপে টিপে, নিঃশব্দে দরজার কাছে গিয়ে ম্যাজিক আইতে চোখ রাখল রুচি। একজন লম্বা মতন লোক, তার গায়ে বর্ষাতি। বর্ষাতি কেন, বাইরে কি বৃষ্টি পড়ছে নাকি ? না তো। ফর্সা মুখ, সরু গোঁফ, মাথায় অনেক চুল। কে এই লোকটি, রুচি তো চেনে না।

লোকটি বেল দিয়েই যাচ্ছে। কোনও সাড়াশব্দ করছে না রুচি। তার একটু একটু ভয় করছে। অথচ চোখ সরাতেও পারছে না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে অচেনা আগন্তুককে।

এবারে লোকটি তালাটা দেখতে পেয়েছে। একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দরজার তলা দিয়ে কী যেন ঢুকিয়ে দিচ্ছে। একটা কাগজ। রুচি সঙ্গে সঙ্গে সেটা তুলল না। পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

আবার লিফটের দরজার শব্দ। ফিরে যাচ্ছে লোকটি। ম্যাজিক আই দিয়ে আবার দেখে নিল রুচি, লিফট নেমে গেছে, লোকটি নেই।

সে কাগজটা তুলল।

খবরের কাগজ থেকে কাটা রঙিন ছবি। বরফ ঢাকা একটা পাহাড়ের চূড়া। কোনও ক্যাপশান নেই। কোন পাহাড় তা বোঝা যাচ্ছে না। রুচি ছবিটা উল্টেপাল্টে দেখল, কোনও কথা বা কারোর নামও লেখা নেই। এরকম একটা ছবি দেওয়ার মানে কী ? কে দিল, তাও তো বোঝা যাবে না।

রুচি নিজের ঘরের দেওয়ালে এই ধরনের ছবি সেঁটে রাখে। বরফ ঢাকা পাহাড়ের ছবি একটাও নেই। সেই জন্যই কি কেউ দিয়ে গেল ? কিন্তু লোকটি জানবে কী করে যে রুচির এরকম একটা ছবির দরকার ছিল। কে ওই রহস্যময় পুরুষ ? সে আজকেই এল কেন ?

সব কেন-র তো উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না।

রুচির খুব ইচ্ছে করল, লোকটির সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু সে তো কোনওক্রমেই দরজা খুলতে পারত না।

সে দৌড়ে চলে এল বারান্দায়।

যদি লোকটিকে এখান থেকে দেখা যায়। যদি হাঁটার ভঙ্গি দেখে চেনা যায়।

পাঁচতলার বারান্দাটির উঁচু রেলিং। রুচি যখন ছোট ছিল, প্রায়ই রাস্তার দিকের এই বারান্দায় এসে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত চুপ করে। সাবধানতার জন্য রেলিং উঁচু করা হয়েছিল। এখন রুচির গলা পর্যন্ত।

সে একটা টুল এনে তার ওপর দাঁড়িয়ে দেখল অনেকখানি। সেই রেইনকোট পরা লোকটিকে দেখা গেল না, এর মধ্যেই বেরিয়ে গেছে কিংবা এ বাড়ির অন্য ফ্ল্যাটের কেউ ?

এ বাড়ির কেউ হলে গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে রাখবে কেন ? রুচি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, আকাশে মেঘ কুণ্ডুলি পাকাচ্ছে মেঘ, ঢেকে দিয়েছে চাঁদ, বৃষ্টি হতেও পারে। কিন্তু বৃষ্টি নামবার আগেই কেউ বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে রাখবে ?

তারপর রুচির মনে হল, বাইরের দরজায় তালা লাগালেও তো এই ফ্ল্যাটে থেকে বাইরে বেরনো যায় ? কেন, এই বারান্দা দিয়ে।

পাঁচতলার বারান্দা দিয়ে অবশ্য রাস্তায় নামা যায় না। কিন্তু খাঁচার পাখি যা পারে না, জেলখানার বন্দিরা যা পারে না, রুচি তা পেয়ে ডানা মেলে আকাশে উড়ে যেতে চাইল। রাত পৌনে একটায় মা ফিরে এসে দেখবে, দরজার বাইরে তালা বন্ধই আছে। কিন্তু রুচি নেই ভেতরে।

না, রুচি অত বোকা নয়। সে জানে, তার ডানা নেই। আকাশে উড়তে গেলে সে ধপাস করে পড়ে যাবে রাস্তায়। এত উঁচু থেকে পড়লেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যাবে। সে মরবে কেন ? মাকে চমকে দেওয়ার জন্যে কি কেউ মরে। আরুণির চিঠির উত্তর হয়নি এখনও।

তা ছাড়া, পাঁচতলার ওপর থেকে পড়লে যদি ফ্রক-ট্রক উল্টে যায়, খুব বিশ্রী দেখাবে, লজ্জারও ব্যাপার হবে।

রুচি টুল থেকে নেমে এল। ইচ্ছে করলেই যে বন্ধ ফ্ল্যাট থেকেও বেরনো যায়, এইটুকু জেনেই ভাল লাগল তার।

রুচি একটা গোলাপি রঙের ফ্রক পরে আছে। নেমন্তন্ন বাড়ি যাওয়ার জন্য মা শালোয়ার কামিজ বার করে রেখেছিল। দু-একদিন শাড়িও পড়েছে রুচি। তার ক্লাসের অনেক মেয়ের চেয়ে সে লম্বা, শাড়ি পড়লে তাকে প্রায় বড়দের মতন দেখায়। বড়দের জগতে প্রবেশ করতে ঠিক আর কতদিন বাকি আছে ? আরুণি একদিন বলেছিল, স্কুল ছেড়ে কলেজে এলেই ছেলেমেয়েরা আর ছেলে মেয়ে থাকে না, তখন তারা তরুণ-তরুণী হয়ে যায়। আরুণি যেমন কলেজে ঢুকেছে। রুচির যে এখনও অনেকটা দেরি।

অথচ শাড়ি পড়লে কেউ কেউ তাকে কলেজের তরুণী মনে করে।

আমি যদি একদিন শাড়ি পড়ে কলেজে যাই তোর সঙ্গে ? কেউ বুঝতে পারবে ?

তুই কলেজে যাবি। ভ্যাট ! দেখতেই ধ্যাড়েঙ্গা হয়েছিস ? তোর মুখ দেখলেই বোঝা যাবে, এখনও তোর নাক টিপলে দুধ বেরোয়।

আমি মোটেই দুধ খাই না।

দুধ খেতে হবে কেন ? তোর মুখখানাই বাচ্চা হরিণের মতন।

বাচ্চা হরিণ ? আমি তো দেখিনি। তুই দেখেছিস ?

অনেক দেখেছি। গত বছর যে বেতলা রিজার্ভ গেলুম। একঝাঁক হরিণ, তার মধ্যে তিনটে বাচ্চা। একটি হরিণের মুখ ঠিক তোর মতন। সেটা আবার খুব লাজুক।

আরুণি প্রায়ই ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে অনেক জায়গায় বেড়াতে যায়। একটা জঙ্গলের গল্প বলেছিল ঠিকই।

রুচি ঠিক করল, সে ফ্রক ছেড়ে এখন শালোয়ার কামিজ পরে নিজেকে আয়নায় দেখবে।

অন্য সময় সে বাথরুমে গিয়ে পোশাক পাল্টায়। কিংবা নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে। এখন তো তার কোনও দরকার নেই।

বারান্দা থেকে ভেতরে এসে সে ফ্রকটা খুলে ফেলল। তার পর প্যান্ট। কেউ দেখবার নেই। এই অবস্থায় সে সারা ফ্ল্যাট ঘুরতে পারে। রান্না ঘরে গিয়ে খাবার গরমও করতে পারে। গুমোট গরমের মধ্যে এখন আর কিছু না পরলেও চলে। তার একটুও লজ্জা করছে না।

বর্ষাতি গায়ে দিয়ে কে এসেছিল ? কেন দরজার তলা দিয়ে শুধু একটা পাহাড়ের ছবি দিয়ে, আর কিছু না জানিয়ে, অদৃশ্য হয়ে গেল একেবারে ?

শরীরে একটাও সুতো নেই, সেই অবস্থায় সে বাবা-মায়ের ঘরে ঢুকে দাঁড়াল বড় আয়নাটার সামনে। নিজেকে দেখল।

আমি বাচ্চা হরিণ ? মোটেই না।

এই ঘরটায় রুচি বেশি আসে না। এ বছরের নতুন ক্যালেন্ডারটা সে আগে ভাল করে দেখেইনি।

তিনখানা ঘরের অ্যাপার্টমেন্ট। একখানা তো বসবার ঘর, আর যতদিন দিদি ছিল, ততদিন রুচির নিজস্ব ঘর ছিল না। দিদির ঘরে সে পড়তে বসত বটে। কিন্তু রাত্তিরে এসে ঘুমোত মা-বাবাদের সঙ্গে। দিদিটা এমন হিংসুটে, কিছুতেই নিজের বিছানায় শুতে দিতে না রুচিকে।

দিদি চলে গেছে চার বছর আগে।

দিদিকে নিয়ে অশান্তি চরমে উঠেছিল। সে যেন প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল, সে মা-বাবার কোনও কথা শুনবে না। যখন ইচ্ছে বাড়ি ফিরবে, সঙ্গে বন্ধুদের নিয়ে আসবে, মেয়ে আর ছেলে বন্ধু, ঘরের দরজা বন্ধ করে হা-হি-হি-হি করবে ঘন্টার পর ঘন্টা। তাকে শাসন করার কোনও উপায় নেই। বাবা তো কিছুই বলবে না। মা যতই বকুনি দিক, টুকুন বলবে, তাহলে আমাকে হস্টেলে পাঠিয়ে দাও।

উনিশ বছর বয়স থেকেই টুকুনের এরকম স্বভাব পরিবর্তন শুরু হয়। সবাই বলত, শ্রীলার দুটি মেয়ে সম্পূর্ণ দুরকম। টুকুনের সঙ্গে রুচির কোনও মিলই নেই। রুচির চেয়ে টুকুন বেশি সুন্দর। অবশ্য বুলা মাসি বলেছিল, আরও বড় হলে রুচির রূপ খুলবে।

টুকুন নিজেই জানিয়েছিল, সে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে গাঁজা খেয়েছে। মদ চেখে দেখেছে দু-একবার। এসব স্বীকার করতে তার কোনও লজ্জা নেই। একদিন বাবাকে সে স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কলেজ জীবন থেকে মদ খাওনি। তোমাদের সময় ওটার চল হয়নি।

চল হয়নি কী বলছিস ? তুই জানিস না। এ দেশের ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা গাঁজা খেতে শিখেছে আমেরিকান হিপিদের কাছে থেকে। সেই ষাটের দশকে। আমার কলেজের বন্ধুরাও খেত, কিন্তু আমি কখনও টান দিইনি।

শ্রীলা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিল, আমিও তো প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছি, আমি কোনওদিন ওসব ছুঁয়ে দেখিনি। যত রাজ্যের বাজে ছেলেমেয়েরা।

টুকুন বলেছিল, ওসব নিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্ট করলে মোটেই বাজে ছেলেমেয়ে হয় না। সুজয়কে তো তুমি চেন, সে হায়ার সেকেন্ডারিতে থার্ড হয়েছিল --

স্কুলে ভাল রেজাল্ট করা অনেক ভাল ছেলেই কলেজে এসে বখে যায়। অনার্স পর্যন্ত রাখতে পারে না। দেখবি, ওই সুজয়টা উচ্ছন্নে যাবে।

রুচি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল।

গাঁজা কাকে বলে, তা সে জানেই না তখন। উচ্ছন্ন কথাটারও মানে জানে না।

রজত বলেছিল, হ্যাঁ আমরা একটু আধটু ওসব করেছি বটে তাও বাড়িতে লুকিয়ে। বাবা-মাকে ভয় পেতাম। তোরা খোলাখুলি এসব করিস কী করে ?

শ্রীলা বলেছিল, তুমিই তো লাই দিয়ে মেয়েটার মাথা খেয়েছ।

টুকুন বলেছিল, বাবা-মায়ের কাছে লুকোনোটাই তো খারাপ। তোমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। আমি ভালই জানি, ওসব একটু-আধটু চেখে দেখলেও আমি নষ্ট হয়ে যাব না।

বাবা চুপ করে গেলেও মায়ের সঙ্গে রোজ ঝগড়া লাগত টুকুনের। তারপর সুজয় উচ্ছন্নে গেল কিনা কে জানে, চলে গেল দিল্লি, তার সঙ্গে সঙ্গে টুকুন। এখন ওরা জার্মানিতে।

তারপর থেকে বাড়িটা শান্ত হয়ে গেছে।

রুচি যখন এই ঘরে শুত, তখন তার একটা আলাদা খাট ছিল। এখন সেই খাটটা কোথায় গেল কে জানে।

একটা দিনের কথা রুচি কিছুতেই ভুলতে পারে না। এমনিতে তার গাঢ় ঘুম। হঠাৎ একদিন ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, ঘর অন্ধকার, একেবারে মিশমিশে অন্ধকার নয়, কিছু একটা শব্দ পেয়ে তার মনে হয়েছিল, পাশের বিছানায় মা আর বাবা মারামারি করছে আর কী যেন বলছে।

সে ভয় পেয়ে মা বলে ডেকে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা দুজনেই চুপ। আর কোনও শব্দ নেই।

সে উঠে আলো জ্বেলেছিল।

মা আর বাবা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে পাশাপাশি। রুচি বাথরুমে গেল, ফিরে এল, আবার নিভিয়ে দিল আলো, এর মধ্যেও মা-বাবার ঘুম ভাঙল না। তবে সে মারামারির শব্দ আর কথা শুনেছিল কী করে ? তবে কি সত্যি সত্যি কিছু শোনেনি, সেটা স্বপ্ন ?

সেই খটকাটা আজও যায়নি। অনেকদিন পর রুচি শুয়ে পড়ল এই বিছানায়। এতে কেমন যেন বড়দের গায়ের গন্ধ। অন্যরকম। রুচি নিজে কবে, ঠিক কখন থেকে বড়দের জগতে ঢুকবে ? বড়দের জগত মানে একলা একলা বাড়ি থেকে বেরোবার স্বাধীনতা। নিজের বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া। নিজের পোশাক নিজে বেছে নেওয়া।

কলেজে ভর্তি হলেই সেই স্বাধীনতা পাওয়া যায় ? তার যে অনেক দেরি।

বিছানাটায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় সে ধড়মড় করে উঠে বসল।

যদি সে এই বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ত ? মা-বাবার বিছানায় একদিন ঘুমোনো দোষের কিছু নয়, কিন্তু সে যে কিছু পরে নেই। মা-বা ফিরে এসে, তালা খুলে ঢুকে, ঘুমন্ত রুচিকে এই অবস্থায় দেখলে --

খাট থেকে নেমে, দৌড়ে গিয়ে ফ্রকটা পরে নিল রুচি। তার খিদেও পেয়েছে।

ফ্রিজ থেকে বার করল ভাত আর মাংস। স্টিলের বাটি মাইক্রোওয়েভ ওভেনে দেওয়া যায় না, রুচি জানে। রান্না ঘরে এসে খুঁজতে লাগল সাদা রঙের পাত্র।

হঠাৎ তার একটা দরজা চোখে পড়ল অন্য দিকের দেওয়ালে। সেদিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল রুচি।

এ দরজাটা অনেকদিন খোলা হয় না। এদিক থেকে ছিটকিনি বন্ধ। পাল্লার গায়ে ঝুলকালি জমে গিয়েছে। আশ্চর্য, অন্য সময় এ দরজাটার কথা মনেও পড়ে না।

ছিটকিনিটা খোলার চেষ্টা করল রুচি। খুব টাইট হয়ে গিয়েছে, হাতে কালি লেগে যাচ্ছে। তবু খুলে দেখার জন্য ঝোঁক চেপে গেল রুচির। একটা হাত মোছার ন্যাকড়া এনে ছিটকিনিটা ধরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে খুলে গেল এক সময়।

একটু দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল রুচির ঠোঁটে।

বড়রা জানে না, এমনটা একটা কিছু জেনে ফেললে দারুণ আনন্দ হয়। এই দরজাটা বাইরেও একটা সরু বারান্দা। কোনও রকমে একজন মানুষ যেতে পারে। সেই বারান্দাটার আর একদিকে বাথরুম, সেখানেও একটা পেছনের দরজা আছে।

পুরোনো আমলের বাড়ি।

একসময় বাড়ির মেথররা পেছনের একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে আসত বাথরুম পরিষ্কার করতে। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে, ঘরের ভেতর দিয়ে মেথরদের যাওয়ার নিয়ম ছিল না। এখন চোর-ডাকাতদের ভয়ে সে নিয়ম বদলে গিয়েছে। ঘোরানো সিঁড়িটা এখনও আছে বটে, কিন্তু একেবারে তলার জায়গাটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে পাঁচিল দিয়ে, বাইরের কেউ আসতে পারবে না।

কিন্তু রুচি তো ইচ্ছে করলেই নেমে যেতে পারে এই সিঁড়ি দিয়ে। মা কিংবা বাবা সেটা খেয়ালই করেননি, এই সিঁড়িটার কথা মনেই নেই। তাহলে আর বাইরে তালা লাগাবার কী মানে হয় ?

ঘোরানো সিঁড়িটা দিয়ে কয়েক ধাপ নামলও রুচি। সে বন্দীনি নয়, ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে যেতে পারে। এই জানাটাই যথেষ্ট। এখন আর সে যাবে কোথায় !

পেছন দিকের পাঁচিলের ওপাশেই একটা বস্তি।

মা-বাবাদের ঘর থেকেও বস্তিটা দেখা যায়, কিন্তু সে ঘরের বস্তির দিকের জানলাটা বন্ধই থাকে সব সময়, যাতে ওখানকার আওয়াজ-টাওয়াজ শোনা না যায়। এই সিঁড়ি দিয়ে সব কিছু দেখা যায় স্পষ্ট। উঠোন, রান্নাঘর, স্নানের জায়গা। একটা টিউবওয়েলের ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে।

একটা ঘর থেকে বেরিয়ে, উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল একটি মেয়ে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বেরিয়ে এসে উঠোনের তার থেকে কাপড়-জামা তুলতে লাগল।

এত ওপর থেকে দেখেও মেয়েটিকে চিনতে পারল রুচি। ওর নাম অলকা। এই বাড়ির অন্য একটা ফ্ল্যাটে কাজ করেছে কিছুদিন। হয়তো রুচিরই বয়েসি, কিংবা এক বছরের বড়।

রুচিদের চব্বিশ ঘন্টার কোনও কাজের লোক নেই। ঠিকে কাজের মেয়ে আছে দুজন, একজন ঘরের সব কাজ করে, আর একজন রান্না। রান্নার মেয়েটি সন্ধে সাতটার মধ্যে রাত্তিরের রান্না সেরে রেখে চলে যায়। ফ্ল্যাটের মধ্যে সর্বক্ষণ কোনও কাজের লোক ঘুরঘুর করবে, তা পছন্দ নয় শ্রীলার। সে পুরুষও রাখে না। নিউ আলিপুরে তার দিদির বাড়িতে একজন নতুন কাজের লোক জামাইবাবুকে কুত্তার বাচ্চা বলেছিল, তারপর থেকে সমস্ত আত্মীয়স্বজন বাড়িতে পুরুষ লোক রাখা নিষিদ্ধ।

বাসন মাজা -- ঘর মোছা মেয়েটি একবার দেশে যাওয়ার জন্য এক মাসের ছুটি নিতে চেয়ে, বদলি হিসেবে এনেছিল এই অলকাকে। তাও এক বছর আগের কথা। অলকা মেয়েটি দেখতে বেশ, গায়ের রং মাজা মাজা, শুধু তার নাকে একটা নাকছাবি দেখে মজা লেগেছিল রুচির। তার চেনাশোনা কোনও মেয়ে নাকে ওসব পরে না।

মেয়েটির নাম শুনে শ্রীলা হাসতে হাসতে বলেছিল, আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, কাজের মেয়েদের নাম মানদা, ক্ষেমি, টেঁপির মা এই সব হত। এখন কেমন সব শৌখিন নাম, সুপ্রিয়া, পাপিয়া, মল্লিকা। এখন আর তফাত বোঝার উপায় নেই। অলকা নামটাও বেশ।

রজত বলেছিল, তোমার শ্রীলা নামটাও কিন্তু তেমন আধুনিক নয়। ওই নামেও কাজের মেয়ে থাকতে পারে। নাম রাখার ব্যাপারে তো কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা যায় না।

শ্রীলা বলেছিল, আর তোমার রজত নামটাই বা কী এমন ভাল ? রজত বলেছিল, আমাদের অফিসে একজন বেয়ারার নামও রজত। সবাই যখন তাকে ডাকবার জন্য রজত, রজত বলে চঁচায় তখন আমি চমকে চমকে উঠি। সকলেরই যে কোনও নাম রাখার স্বাধীনতা আছে।

রুচি বলেছিল, মা, ওর নাম কিন্তু আলোকা নয়, অলকা।

তুই কী করে জানলি ? আলোকা আর অলকায় কোনও তফাত আছে নাকি ? সবাই তো অলোকাই বলে।

অলোকা নামের কোনও মানে হয় না।

মানে হয় না ? এই মেয়েটা, তুই লিখতে পড়তে জানিস কিছু ? নিজের নাম লিখতে পারিস ?

হ্যাঁ, পারি।

নামের বানান কর তো।

অ লয়ে ও কার কা।

দেখলি ?

ওটা ভুল।

রজত বলেছিল, আমার মনে হয়, রুচি ঠিকই বলছে। অলকা মানে কুবেরের রাজধানী। তবে, অলোকা শব্দটারও বোধহয় কোনও মানে আছে।

না নেই।

তুই এত জোর দিয়ে বলছিস কী করে রে রুচি ?

আমাদের গানের ইস্কুলে গীতাদি একটা গানের ডিকটেশন দিচ্ছিল, তাতে একটা লাইন ছিল, 'কোন অলকার বিরহিণী রে, চাহনি ফিরে'। তখন গীতাদি বললেন, অলকা মানে অলকাপুরী। অলোকা লিখ না, তার কোনও মানে হয় না। বাড়ি এসে আমি ডিকশনারি দেখলাম, অলকা কথাটার আরও মানে হয়। অলকানন্দা নদীর ধারের শহর ; আট থেকে দশ বছর বয়সের মেয়ে ; মুখে চন্দনের ছাপ। আর অলোকা বলে কোনও কথাই নেই ডিকশনারিতে। শুধু অলোক আছে, তার মানে হচ্ছে পাতাল। কিংবা কোনও নির্জন জায়গা।

একটি কাজের মেয়ের নামের প্রসঙ্গে হঠাৎ জানা গেল, রুচি খুব মন দিয়ে বাংলা পড়ে। রজত একেবারে চমৎকৃত।

মেয়েটির বেশ পছন্দও হয়েছিল শ্রীলার, কিন্তু রজত রাখতে রাজি হয়নি। এতটুকু মেয়ে, চাইল্ড লেবার সে পছন্দ করে না। তাছাড়া মেয়েটি তার নিজের মেয়ের সমবয়সি। রুচি পড়াশোনা করবে, আর মেয়েটি ঘরের কাজ খেটেখুটে করবে, এ দৃশ্য খুবই দৃষ্টিকটু।

এ বাড়িতে রাখা না হলেও অন্য একটি ফ্ল্যাটে কাজ পেয়েছিল অলকা। সিঁড়িতে প্রায়ই দেখা হত তার সঙ্গে।

একদিন রুচি তাকে তাকে বলেছিল, এই, তুমি কিন্তু নিজের নাম আর অলোকা লিখবে না।

বেড়ালের মতন ফোঁস করে উঠে মেয়েটি বলেছিল, বেশ করব লিখব, তুমি ইস্কুলে যাও, আমি কি যাই ? আমি তো পাতালের মেয়ে।

কথাটা খুব বুকে লেগেছিল রুচির।

সে ইস্কুলে যায়, অলকা কেন যায় না ? এরা গরিব বলে ? রুচি যদি বস্তিতে জন্মাত, তাহলে সেও লেখাপড়া না শিখে লোকের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করত ? কেউ তো ইচ্ছে করে কোথাও জন্মাতে পারে না। তবু জন্মের জন্য এত তফাত হয়ে যায় !

অলকাপুরী প্রায় স্বর্গের মতন, আর অলোকা মানে পাতাল। মেয়েটা কী রকম বলল, আমি তো পাতালেরই মেয়ে !

রুচিদের দেখলেই ও মেয়েটা কেমন যেন রাগ রাগ করে তাকায়। রুচি সেধে কথা বলতে চাইলেও উত্তর দেয় না।

এখন রুচি দেখল, উঠোনের তার থেকে জামাকাপড় তোলার পর অলকা রান্নাঘর থেকে একটা তোলা উনুন নিয়ে এল বাইরে। সেটা গনগন করে জ্বলছে। একটা মোড়া নিয়ে সেই উনুনের সামনে বসে অলকা রুটি সেঁকতে লাগল। কেমন যেন বড়দের মতন ভাব।

অলকা সকালবেলা দুধ আনতে যায়, কাজের বাড়ির জন্য দোকান থেকে এটা সেটা কিনে আনে। একদিন রুচি সর্দার শঙ্কর রোডে রাণু মাসিদের বাড়ি গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে গাড়িতে। যেতে যেতে হঠাৎ দেখল, রাস্তা দিয়ে একা একা হেঁটে যাচ্ছে অলকা। এত দূরেও একা একা আসার স্বাধীনতা আছে মেয়েটার। বস্তিতে জন্মাচ্ছে বলেই রুচির অনেক আগেই সে বড়দের জগতে চলে এসেছে।

রণ চৌধুরীর বাড়িতে রুচি কেন গেল না, তা কোনওদিন কারোকে বলবে না।

বাবলুর মামাটা খুব অসভ্য। ব্যস এই পর্যন্তই যথেষ্ট।

টুম্পা আর বাবলু দুজনেই বেশ ভাল। এদের সঙ্গে গল্প করতে, ক্যারাম খেলতে ভাল লাগে। কিন্তু ওদের মামাটা সেই ঘরে একবার আসবেই আসবে।

সেই মামাটা আরুণির সঙ্গেই একই কলেজে পড়ে। আরুণির বন্ধু, সে নাকি দারুণ ডিবেট করে আবার ক্রিকেট খেলায় কলেজ টিমের ক্যাপ্টেন। আরুণি তার এই বন্ধু প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এটা কী করে হয়, একি মানুষ, অন্যদের কাছে ভাল, অথচ এক একজনের কাছে খারাপ ? বাইরে ভাল, গোপনে খারাপ। আরুণি থাকে এই বাড়িরই তিনতলার ফ্ল্যাটে। রুচিদের মতন ওদের পরিবারটা অত ছোট নয়। আরুণিরা তিন ভাই, দু-বোন, আবার একটা পিসিও থাকে, সর্বক্ষণ জমজমাট বাড়ি।

আরুণির নিজস্ব পড়ার ঘর নেই বলে সে প্রায়ই ছাদে উঠে আসে বই নিয়ে। ছুটির দিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ছাদেই কাটায়। খোলা ছাদ, গরম কালে দারুণ গরম, তাও আরুণির ভ্রুক্ষেপ নেই। শুধু জলের ট্যাঙ্কটার পাশে একটুখানি ছায়া পড়ে।

রুচিদের ফ্ল্যাট পাঁচ তলায়, তার ওপরেই ছাদ। বাড়ির অন্য কেউ ছাদে বিশেষ যায় না।

একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। সে দিনটা ছিল পনেরোই অগাস্টের ছুটি। আরুণির ছদে থাকবার কথা। বৃষ্টি পড়লে সে কী করে ? কৌতূহলে রুচি উঠে গিয়ে ছাদে উঁকি দিল।

বেশ বৃষ্টি পড়ছে। তারও মধ্যে জলের ট্যাঙ্কের পাশে গুটি মেরে বসে আছে আরুণি। বৃষ্টির ছাঁট লাগছে, তাতে যেন হুঁশই নেই।

রুচি দৌড়ে গিয়ে বলল, অ্যাই বৃষ্টিতে ভিজছ কেন ? উঠে এস, উঠে এস।

আরুণি বই থেকে চোখ তুলে এমনভাবে তাকাল, যেন সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না, দেখতেও পাচ্ছে না। সাদা চোখ।

তারপর বলল, তুই ভিজছিস কেন ? তোর না গত মাসে জ্বর হয়েছিল ?

বৃষ্টিতে ভিজলে তোমার জ্বর হতে পারে না ?

না।

আ-হা-হা।

সত্যিই বৃষ্টিতে ভিজলে আমার কিছু হয় না। আমার নাম যে আরুণি।

নামের সঙ্গে আবার ভেজার কী সম্পর্ক !

আছে, আছে। যার নাম রুচি, সে বৃষ্টিতে ভিজলেই ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে হাঁচবে। তারপর জ্বরে পড়বে। আর যার নাম আরুণি, সে বৃষ্টিকে কলা দেখাবে। তুই আরুণি নামের মানে জানিস ! আরুণি কে ছিল ?

জানি না।

যা, ডিকশনারি দেখ গিয়ে। এক্ষুনি যা।

আরুণির কাছে থেকেই রুচি ডিকশনারি দেখতে শিখেছে। কথায় কথায় সে হঠাৎ একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞেস করে। রুচি না পারলে সে নিজে মানে বলে দেয় না। অভিধান দেখার জন্য জোর করে।

রুচিদের একটা বেশ মোটা বাংলা অভিধান আছে। সেটার মধ্যে শুধু কথার মানে নয়, অনেক গল্পও থাকে।

আরুণি নামে একজন ঋষিকুমার ছিল। মানে ছাত্র ঋষি, তার গুরুর নামটা বেশ শক্ত মতন। সেই গুরুর আদেশে আরুণি গেল জমির আল আটকাতে। এত জোর বৃষ্টির তোড় যে আল আর আটকায় না। তাই আরুণি সেখানে শুয়ে পড়ে জল আটকে রাখল। সারাদিন দারুণ বৃষ্টি, আরুণি আর পাত্তা নেই, সন্ধের সময় গুরু খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখলেন, আরুণি জল কাদা মেখে ভূত হয়ে আছে। তা দেখে গুরু তাকে আশীর্বাদ করলেন, তার একটা অন্য নাম হয়ে গেল। এত বৃষ্টিতে ভিজেও আরুণির জ্বর হয়নি।

নামের মিল আছে বলেই এই আরুণিও বৃষ্টিতে ভিজবে। পরেও রুচি দেখেছে, বৃষ্টির মধ্যে আরুণি দিব্যি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এর সত্যিই জ্বর হয় না।

একদিন রুচি জিজ্ঞেস করেছিল, আরুণিদা, তুমি মদ খাও ?

মদ ? হঠাৎ এরকম বাজে কথা বলছিস কেন ?

খাও কি না বল না !

না।

সত্যি বলছ ?

তোর কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন ? মানুষ যাকে ভয় পায় না, তাকে মিথ্যে কথা বলতে যাবে কেন ? মানুষ যাকে ভয় পায়, তাকে মিথ্যে কথা বলে।

তুমি গাঁজা খাও ?

দুর দুর।

তুমি কলেজে পড়, এসব খাও না ?

কলেজে পড়লেই বুঝি মদ-গাঁজা টানতে হবে ? পুঁচকে মেয়ে, তোকে এসব কে শিখিয়েছে ?

আমার দিদি বলত।

আমি কোনওদিন সিগারেটও টেনে দেখিনি। আমার সামনে অন্য কেউ সিগারেট ধরাবার সাহস পায় না। কলেজের কিছু ছেলেমেয়ে ও সব করে, এক ধরনের ব্র্যাভাডো দেখতে চায়।

ব্র্যাভাডো মানে কী ?

দুঃসাহস দেখানেপনা। নিজেদের অ্যাডাল্ট প্রমাণ করার চেষ্টা। কারোর কারোর কিছুদিন পরে ওই ঝোঁকটা কেটে যায়। কেউ কেউ নেশাখোর হয়ে মরে !

রুচি বুঝতে পারে, কলেজে পড়া মানেই বড় হয়ে যাওয়া বটে, কিন্তু সব বড় হওয়া একরকম নয়।

আর একটা ব্যাপার, কেউ কেউ যখন রুচির কাঁধে হাত রাখে, আদর করার নামে বুকে জড়িয়ে ধরতে চায়, তখন তার খারাপ লাগে। আবার দু-একজন সম্পর্কে ইচ্ছে হয়, একবার অন্তত তার হাতটা ছুঁয়ে নিক।

আরুণি কখনও তার হাত ছোঁয় না। আর আরুণির বন্ধু ঋজু কেন ও রকম অসভ্যতা করে ?

এখন বাড়িতে বাবা-মা নেই, আরুণিদা এলে অনেক গল্প করা যেত। আরুণিদা অনেক বই পড়ে। দিদির বইগুলো সব রেখে গেছে, আরুণিদা মাঝে মাঝে বই ধার নিতে আসে।

কিন্তু বাইরের থেকে তালাবন্ধ, আরুণিদা আসবে কী করে ?

ওই যে মেথরদের সিঁড়ি।

ওই সিঁড়ি দিয়ে রুচি যেমন নেমে যেতে পারে, সেই রকমভাবে আরুণিও তো উঠে আসতে পারে ওপরে।

আরুণি জানবে কী করে ? টেলিফোনে ডাকা যায়।

কিন্তু প্রস্তাবটা শুনে আরুণি যদি বকুনি দেয় ? আরুণি তো তার বন্ধু নয়। আরুণি বড়দের দলে চলে গেছে, বড়রা ছোটদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না।

আরুণিদা, আরুণিদা, তুমি এখন কী করছ ? হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করার মানে ? ভ্যারেন্ডা ভাজছি। না, সত্যি কী করছ বল না ?

আমি টিভি দেখি না। টেলিফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করি না। রাত নটার সময় ভদ্রলোকেরা যা করে, তাই করছি। বই পড়ছি একটা।

তুমি একবার ফ্ল্যাটে আসবে ? কেন ? আমাদের বাড়িতে এখন কেউ নেই। বাড়িতে কেউ নেই বলে আমাকে আসতে হবে, এ কি অদ্ভুত কথা। যদি বলি, একা থাকতে আমার ভয় করছে। ভয় করছে ? সাধে কি আর পুঁচকে মেয়ে বলি। একা থাকলে ভয়

পাওয়ার বদলে কত ভাল ভাল কাজ করা যায়। প্রাণ খুলে বেসুরো গলায় গান গাইতে পারিস।

আমার মোটেই বেসুরো গলা নয়। তা ছাড়া রোজই তো গান প্র্যাকটিস করি। আমার কাজ এমন কিছু করতে ইচ্ছে, যা অন্যদিন করি না।

তোর সেরকম ইচ্ছে হতে পারে। কিন্তু আমার সে রকম ইচ্ছে হবে কেন ? আমার তো ইচ্ছে করছে, এই হাতের বইটা শেষ করতে। শোন, তোর যদি সত্যিই ভয় করে, তা হলে তুই চলে আয় আমাদের ফ্ল্যাটে। মাসিমা-মেসোমশাই যতক্ষণ না ফেরেন। এখানে কাটাতে পারিস। আমার সঙ্গে খেয়ে নিতে পারিস। তুতুনের সঙ্গে টিভি দেখতে পারিস। আমাকে এখন বিরক্ত করবি না, যা।

এটা টেলিফোনের কথা নয়। এমনই এমনই কথা। যেন আরুণি দাঁড়িয়ে আছে সামনে। রুচি সব সময় দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। সে জানে, ফোন করলে এই ধরনের কথা বলত আরুণি।

আরুণির কোনও কলেজের বন্ধু ডাকলে কি সে যেত না ? রুচি যখন কলেজে যাবে, ততদিনে আরুণি কলেজ ছেড়ে অফিস।

আরুণির সঙ্গে তার বিয়ে তো হবে না। যদিও রুচি লক্ষ করেছে, বর আর বউদের মধ্যে, বউদের বয়েস বরেদের চেয়ে কম হয়। অন্তত পাঁচ-ছ'বছর। তার নিজের বাবাই তো মায়ের চেয়ে ন-বছরের বড়। কিন্তু আরুণিদার কাছে ওর কলেজের অনেক মেয়ে আসে। তাদের মধ্যে জয়তী নামের মেয়েটার সঙ্গে আরুণিদার বেশি ভাব। ওই জয়তীই আরুণিদাকে বিয়ে করে ফেলবে।

খিদে পেয়েছে, অথচ খেতে ইচ্ছে করছে না।

নিজের খাবার নিজে নিজে নিয়ে খেতে কি ভাল লাগে ?

অন্যদিন যা করে না, সে রকম একটা কিছু কী করা যায় ?

রান্নাঘরের গ্যাস জ্বালাতে গিয়ে যদি আগুন ধরে যায় হঠাৎ ? কালকের মাংস মোটেই খাবে না রুচি, সে ডিম সেদ্ধই খাবে। সে গ্যাস জ্বালতে পারে।

তবু যদি আগুন লেগে যায় ?

পাঁচতলায় আগুন লাগলে গোটা বাড়ির লোক ভয় পেয়ে যাবে। ছুটে এসে যদি দেখে, বাইরে তালা, তা হলে ধরেই নেবে ভেতরে কেউ নেই। পেছনের সিঁড়িটার কথা কজনের মনে আছে ?

গ্যাসের আগুন জ্বেলে সেদিকে তাকিয়ে রইল রুচি।

কোনওদিন যা মনে হয়নি, সেরকম একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় এল তার। এমনই এমনই যদি আগুন না লাগে, তা হলে ইচ্ছে করে আগুন ধরিয়ে দিলে কেমন হয় ?

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। ছোটাছুটি করছে সারা বাড়ির মানুষ।

বাথরুমের শাওয়ার খুলে চুপ করে বসে আছে রুচি।

জলের ধারা নীচে বসে থাকলেও কি তার গায়ে আগুনের আঁচ লাগবে ?

যা, ইচ্ছে করে কেউ নিজেদের বাড়িতে আগুন লাগায় নাকি ? তাতে রুচি হয়তো প্রাণে মরবে না, পেছনের সিঁড়িটা তো আছেই। কিন্তু তার বইগুলো পুড়ে যাবে। মা আর বাবার কত শখের জিনিস। চিঠির তাড়া। বিয়ের আগে মা আর বাবা কত চিঠি লিখেছে দুজনকে। দিদি একদিন সব পড়েছে আর হেসে গড়াগড়ি গিয়েছে।

মা আর বাবার চিঠি পড়তে নেই। দিদি ও সব কিছু মানে না।

গত বছর দিদি একেবার এসেছিল, কিন্তু এখানে একদিনও থাকেনি রাত্তিরবেলা। দিনের বেলা এসেছে মাঝে মাঝে। সুজয়দা নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে, কখনও সে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না।

বাইরের সিঁড়িটাই মন টানছে বারবার।

বাবা-মাকে সত্যি চমক দেওয়া যায়, যদি রুচি ওই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় রাস্তায়। রাত্তিরে আর ফিরলই না। বাবা আর মা অনেক রাতে এসে দেখবে, খাঁচার পাখি নেই। জেলখানায় বন্দী নেই।

কিন্তু কোথায় যাবে রুচি ?

এখন রাত সাড়ে নটা মোটে, এখনও রাস্তায় মানুষজন হাঁটছে, কিন্তু তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা খুব কম। দিনের বেলা মেয়েরা রাস্তায় বেরোতে পারে, কিন্তু রাত হলেই বাঘ-ভালুক বেরোয়, তারা শুধু মেয়েদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলে।

দিদি যখন প্রথম রাত নটা-দশটায় বাড়ি ফিরত, তার সঙ্গে তর্ক হত রোজ। মায়ের মুখে মুখে কথা বলতে একটুও আটকাত না দিদির।

দিদি একদিন বলেছিল, একতলার প্রীতম আর আমি সমান বয়েসি। সে তো এই মাত্র বাড়ি ফিরল। তার মা তো প্রীতমকে এই জন্য বকেন না। আমি কী দোষ করলাম ?

মা বলেছিলেন, সমান বয়েসি হলেও, একটা মেয়ের কত রকম বিপদ হতে পারে। পুরুষদের তা হয় না।

দিদি বলেছিল, বিপদ মানে কী ? আমি কি গলি-ঘুঁজি বা মাঠের মধ্যে ঘুরি যে গুন্ডা-বদমাইসের পাল্লায় পড়ব ? বড় রাস্তায় ট্রামে-বাসে যাতায়াত করি, তাতে আবার বিপদের কী আছে ? আসলে মান্ধাতার আমলে পড়ে আছে। যেই বারো বছর বয়েস হয়ে যায়, অমনই ছেলে আর মেয়েদের সম্পর্ক তোমাদের বিচার আলাদা হয়ে যায়। মেয়ে ছটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে বাধ্য, আর ছেলেরা খেলতে যাবে, নটা-দশটায় বাড়ি ফিরবে।

মেয়েদের কেন বারণ করা হয়, তা তুই বুঝিস না ?

হ্যাঁ বুঝি। কিন্তু যে ব্যাপারটার জন্য ভয় পাও, সেটা বুঝি দিনের বেলা হতে পারে না ? এই কথাটা জেনে রাখো, অনেক মেয়ে দিনের বেলাতেও চরিত্র নষ্ট করে।

চরিত্র নষ্ট করার মানেটা রুচি বোঝেনি।

এখনও তো ট্রাম-বাস চলছে। রুচি যদি বেরিয়ে একটা বাস চেপে ডিপো পর্যন্ত চলে যায় ? আবার ফেরত বাসে চেপে বসবে।

রুচি বেরিয়ে পড়ল।

সত্যি নয়, মনে মনে।

সে হেঁটে যাচ্ছে, কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না। বাঘ-ভাল্লুক ঘুরে বেড়াচ্ছে না। মোড়ের মাথায় আসতেই একটা দোতলা বাস এসে দাঁড়াল।

পয়সা আনতে ভোলেনি রুচি। তার একটা ছোট্ট ব্যাগ আছে। কন্ডাক্টর তাকে এসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে ?

রুচি তো জানে না, এই বাসটা কতদূর পর্যন্ত কিংবা কোন রাস্তা দিয়ে যায়। সে একটু ভেবেই বলল, ডিপো পর্যন্ত।

একতলা নয়, দোতলায় এসে বসেছে রুচি। আর মাত্র তিন-চারজন যাত্রী, দূরে দূরে বসা। জানলা দিয়ে রাস্তাটাকে অন্যরকম লাগল। অনেক বেশি চওড়া। দোকানগুলো বন্ধ।

যদি ফেরার বাস আর না থাকে ?

এই বাসেই ঘুমিয়ে থাকবে তাহলে ? সকালবেলা তো চলবেই। একটা রাত মা-বাবা চিন্তা করুক না, বেশ হবে।

খানিকবাদে নামবার জন্য একজন লোক উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখেই ধক করে উঠল রুচির বুকটা। রেইন কোট পরা, লম্বা একজন মানুষ। এই তো সে। দরজার তলা দিয়ে একটা পাহাড়ের ছবি দিয়ে চলে এসেছিল।

কে এই লোকটি ? সে রুচির কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, চলো, এবার নামতে হবে যে ! রুচির মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। বুক কাঁপছে। সে মিনমিনে গলায় বলল, এখানে নামতে হবে ? কেন ?

লোকটি বলল, বাঃ, এখানেই তো বাস পাল্টাতে হয়। সেই বাস পাহাড়ে নিয়ে যাবে। সে পাহাড় চূড়ায় বরফ জমে আছে।

রুচি বলল, পাহাড়ে যাব। আপনার সঙ্গে ?

সেই রকমই তো কথা ছিল। তুমি পাহাড়ে যেতে চাওনি।

কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনি না।

যেতে যেতে চেনা হবে। আমি তো তোমাকে চিনি। দুজনের মধ্যে একজন চিনলেই যথেষ্ট।

পাহাড়ে যেতে তো অনেক দিন লাগবে। সোমবার আমার ভূগোল পরীক্ষা।

অনেকদিন কেন লাগবে ? বড় জোর ঘন্টা দুয়েক। ওঠো, ওঠো, আর দেরি কোরো না --

ঘোরালো সিঁড়িটায় দাঁড়িয়ে আপন মনে কথা বলছে রুচি। কিন্তু ওই রকম একজন লোক সত্যি ছবি দিয়ে গিয়েছিল। আর কখনও দেখা হবে লোকটির সঙ্গে ?

না, এত রাতে রাস্তায় বেরিয়ে বাসে চাপতে পারবে না রুচি। মা-বাবাকে অতটা শাস্তিও দিতে পারবে না।

সে নীচের দিকে তাকিয়ে রইল।

পাশের বস্তির সেই উঠোনে এখন গোল হয়ে বসেছে তিন-চারজন। তাদের সামনে থালা। গরম গরম রুটি সেঁকে এক একজনের থালায় তুলে দিচ্ছে অলকা। কী তরকারি দিয়ে রুটি খাচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ওদের খাওয়ার মধ্যে যেন একটা আনন্দ রয়েছে। একটা হিল্লোল আছে।

অন্য ধরনের সুখ আছে।

আবার খুব খিদে পেয়ে গেল রুচির।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল কয়েক ধাপ। মনে মনে নয়, সত্যি। আবার কিছু মনে পড়ায় দৌড়ে উঠে এল ওপরে।

গ্যাসটা জ্বালাই রয়েছে। সাংঘাতিক কান্ড হতে পারত। তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল গ্যাস। এবার সে ঠিক করে ফেলেছে, কী করবে। যা ও কোনওদিন করে না।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে আবার নামতে শুরু করল। যত নীচে নামছে, তত বস্তিটা স্পষ্ট হয়ে আসছে। তিনতলায় আরুণিদের ফ্ল্যাট। এখনও সে পড়ছে ? এই সিঁড়ি দিয়ে রান্নাঘর আর বাথরুম ছাড়া কিছু দেখা যায় না।

একেবারে নীচে নেমে এলে বস্তিটা দেখা যায় না। উঁচু দেওয়াল তোলা আছে। এখান দিয়ে বস্তিতে যাবারও কোনও উপায় নেই।

সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে খানিকটা রাস্তা ঘুরে সে এল বস্তির মধ্যে। সেই উঠোনে। মোট চারজন নারী-পুরুষ গোল হয়ে বসে আছে, তাদের পশে বসল।

দুজন পুরুষ, আর দুজন নারী। আর উনুনের কাছে মোড়ার ওপর বসা অলকা। ঘামে চকচক করছে তার মুখ। বাকি চারজন রুচিকে দেখল, চিনতে পারল কি না বোঝা গেল না, কেউ কিছু বললও না।

অলকা ঠিক চিনেছে। তার মুখে রাগ রাগ ভাব। সে রুচিকে বলেছিল, আমি পাতালের মেয়ে। রুচি নেমে এসেছে সেই পাতালে।

রুচি কিছু বলছে না দেখে অলকা জিজ্ঞেস করল, কী চাই ?

রুচি তার চোখে চোখ রেখে মিনতি করে বলল, আমার খিদে পেয়েছে।

অলকা বলল, খিদে পেয়েছে তো এখানে কেন ? দোকানে যাও।

রুচি তাকিয়ে দেখল। অন্যদের বাটিতে বেগুন পোড়া মাখা। ধনে পাতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

রুচি বলল, আমায় একটা রুটি আর বেগুনপোড়া দেবে ?

একজন প্রৌঢ়া রুচির দিকে একখানা বাটি এগিয়ে দিয়ে বলল, দে অলোকা, ওকে রুটি দে।

রুচি বলল, অলোকা নয়, অলকা।

অলকা ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, না, আমাকে অলোকাই বলবে।

অন্যরা এটা ঠিক বুঝতে পারল না। একজন বলল, আমার আর রুটি লাগবে না। এবার ওকে দে তো মা।

রুচি বলল, একখানা দিলেই হবে।

অলকা অন্যদিকে না তাকিয়ে এক মনে রুটি সেঁকে, গরম রুটি উল্টেও দিচ্ছে। ফুলে উঠছে রুটিটা। অলকা দু-আঙুলে সেটা তুলে আলতো করে ফেলে দিল রুচির বাটিতে।

রুচি মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ে, রুটিটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল বেগুনপোড়া দিয়ে।